মেকআপের প্রসাধনীতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি!

মেকআপ নারীর সাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মেকআপ যেমন নারীর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, তেমনি এর ক্ষতিকর দিকও রয়েছে- যদি ত্বকের ধরন অনুযায়ী সঠিক প্রসাধনী ব্যবহার না করা যায়। কারণ বাজারে চলতি প্রসাধনীতে মেশানো থাকে কিছু না কিছু রাসায়নিক, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক।

ত্বক ভীষণ সংবেদনশীল। আর তাই ত্বকে কোনো কিছু ব্যবহারের আগে তার সম্বন্ধে অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন।যেমন ফাউন্ডেশন এবং মাসকারার মতো মেকআপ যেগুলো নারীরা ব্যবহার করেন, সেগুলো নিরাপদই মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। যার মধ্যে স্তন ক্যান্সার, ইনফেকশন, ব্রণ ও বন্ধ্যত্বের মতো স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

প্রথমত মেকআপে ‘প্যারাবেন’ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেমিক্যালের উপস্থিতি পাওয়া যায়৷ দ্বিতীয়ত ‘ফালেটস’-এর উপস্থিতি অসংখ্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

প্যারাবেন যা মাসকারা এবং মেকআপে পাওয়া যায়। ভেতরে ব্যাক্টিরিয়ার বেড়ে ওঠা আটকাতে, এটি নারীদের স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে ভূমিকা রাখে।

প্যারাবেন ছাড়াও ডিইপি (ডাইথেল ফালেটস) বন্ধ্যত্ব সৃষ্টিতে জড়িত এবং এটি গর্ভবতীকালীন সময়ে শিশুর বেড়ে ওঠায় প্রভাব ফেলে। ফলে আমরা মেকআপ সাবধানতার সঙ্গে এবং কম ব্যবহারের জন্য বলি৷

তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে আমাদের মেকাপ পরিবর্তন করা জরুরি, যেটি কঠিন। তাই আমার উপদেশ সঠিক মেকআপ বাঁছাইয়ে ত্বক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করে নিন।

অতিরিক্ত মেকআপ ব্যবহার করলে কী হয়?

মেকআপে কেমিক্যাল থাকে। কিছুতে কম এবং কিছুতে বেশি। মেকআপ নেওয়া সমস্যা নয়। অতিরিক্ত এবং লম্বা সময়ের (৫ ঘণ্টার বেশি) জন্য এবং প্রতিদিন মেকআপ নেওয়া পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন-

লোমকূপ, ব্রণ, লোমকূপ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং অনুজ্জ্বল ত্বকের মতো সমস্যা দেখা দেয়।

মেকআপ কি ত্বকের বয়স বাড়িয়ে দেয়?

হ্যাঁ, মেকআপের কারণে আমাদের বয়স্ক দেখা যেতে পারে। এর কারণে অকাল বার্ধক্য ঘটতে পারে। অতিরিক্ত মেকআপ ব্যবহারের কারণে ত্বকের গুণও হারিয়ে যেতে পারে। ত্বক শুষ্ক, সংবেদনশীল এবং লাবণ্যহীন দেখা যায়। এ কারণে ত্বকের ধরন অনুযায়ী মেকআপ বাছাইয়ে সব সময় একজন ত্বক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

তাই স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী প্যারাবেনবিহীন এবং গ্লুটেনবিহীন প্রসাধনী অপরিহার্য। কারণ উজ্জ্বল ত্বক বলতে কিছু না, গ্লাস ত্বকই (মসৃণ, কোমল ও দাগহীন) আসল।

লেখক: স্কিন স্পেশালিস্ট, বিউটি অ্যান্ড সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার।

অ্যালার্জি কেন হয়, কীভাবে এড়ানো যায়

অ্যালার্জি একটি জটিল রোগ। শিশু থেকে বৃদ্ধ— সব বয়সি মানুষ এই রোগে ভুগে থাকেন। অ্যালার্জিতে হাঁচি থেকে শুরু করে খাদ্য এবং ওষুধের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

কারও কারও ক্ষেত্রে অ্যালার্জি সামান্য অসুবিধা সৃষ্টি করে। আবার কারও ক্ষেত্রে জীবনকে বিষিয়ে দেয়।

অ্যালার্জি কেন হয়, এ রোগে সর্বাধুনিক চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন অ্যালার্জি ও অ্যাজমা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোবিন্দ চন্দ্র দাস।

হঠাৎ করে হাঁচি এবং পরে শ্বাসকষ্ট হলে অথবা ফুলের গন্ধ নিচ্ছেন বা গরুর মাংস, চিংড়ি, ইলিশ, গরুর দুধ, বেগুন খেলেই শুরু হলো গা চুলকানি বা চামড়ায় লাল লাল চাকা হয়ে ফুলে ওঠা। এগুলো হলে আপনার

অ্যালার্জি আছে ধরে নিতে হবে।

অ্যালার্জি কী? কেন হয় এবং কীভাবে এড়ানো যায়?
প্রত্যেক মানুষের শরীরে এক একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম থাকে, কোনো কারণে এই ইমিউন সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিলে তখনই অ্যালার্জির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

অ্যালার্জি
আমাদের শরীর সবসময়ই ক্ষতিকর বস্তুকে (পরজীবী, ছত্রাক, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া) প্রতিরোধের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করে।

এই প্রচেষ্টাকে রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া বা ইমিউন বলে। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের শরীর সাধারণত ক্ষতিকর নয়; এমন অনেক ধরনের বস্তুকেও ক্ষতিকর ভেবে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সাধারণত ক্ষতিকর নয়, এমন সব বস্তুর প্রতি শরীরের এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে অ্যালার্জি বলা হয়।

অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বহিরাগত বস্তুগুলোকে অ্যালার্জি উৎপাদক বা অ্যালার্জেন বলা হয়।

অ্যালার্জিজনিত প্রধান সমস্যা

* অ্যালার্জিজনিত সর্দি বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস

এর উপসর্গ হচ্ছে— অনবরত হাঁচি, নাক চুলকানো, নাক দিয়ে পানি পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, কারও কারও চোখ দিয়েও পানি পড়ে এবং চোখ লাল হয়ে যায়।

অ্যালার্জিক রাইনাইটিস দুই ধরনের
* সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস: বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হলে একে সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়।

* পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস: সারা বছর ধরে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হলে একে পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস

* ঘন ঘন হাঁচি

* নাক দিয়ে পানি পড়া

* নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া

অন্যান্য উপসর্গ

* চোখ দিয়ে পানি পড়া

পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস

পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের উপসর্গগুলো সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের মতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উপসর্গগুলোর তীব্রতা কম হয় এবং স্থায়িত্বকাল বেশি হয়।

অ্যাজমা বা হাঁপানি

এর উপসর্গ হচ্ছে কাশি। ঘন ঘন শ্বাসের সঙ্গে বাঁশির মতো শব্দ হওয়া বা বুকে চাপ চাপ লাগা। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা লাগা।

অ্যাজমা রোগের প্রধান উপসর্গ বা লক্ষণ

* বুকের ভেতর বাঁশির মতো সাঁই সাঁই আওয়াজ

* শ্বাস নিতে ও ছাড়তে কষ্ট

* দম খাটো অর্থাৎ ফুসফুস ভরে দম নিতে না পারা

* ঘন ঘন কাশি

* বুকে আঁটসাঁট বা দম বন্ধ ভাব

* রাতে ঘুম থেকে উঠে বসে থাকা

আর্টিকেরিয়া

আর্টিকেরিয়ার ফলে ত্বকে লালচে ফোলা ফোলা হয় এবং ভীষণ চুলকায়। ত্বকের গভীর স্তরে হলে হাত-পা ফুলে যেতে পারে। আর্টিকেরিয়ার ফলে সৃষ্টি ফোলা অংশগুলো মাত্র কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী থাকে; কিন্তু কখনো কখনো বারবার হয়। যে কোনো বয়সে আর্টিকেরিয়া হতে পারে। স্বল্পস্থায়ী আর্টিকেরিয়া বাচ্চাদের মধ্যে এবং দীর্ঘস্থায়ী আর্টিকেরিয়া বড়দের মধ্যে দেখা যায়।

সংস্পর্শজনিত অ্যালার্জিক ত্বক প্রদাহ

চামড়ার কোথাও কোথাও শুকনো, খসখসে, ছোট ছোট দানার মতো ওঠা। বহিস্থ উপাদান বা অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে ত্বকে প্রদাহ হলে তাকে অ্যালার্জিক কনটাক্ট ডারমাটাইটিস বলা হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

* ত্বকে ছোট ছোট ফোসকা পড়ে

* ফোসকাগুলো ভেঙে যায়

* চুয়ে চুয়ে পানি পড়ে

* ত্বকের বহিরাবরণ উঠে যায়

* ত্বক লালচে হয় এবং চুলকায়

* চামড়া ফেটে আঁশটে হয়

অ্যাকজিমা

অ্যাকজিমা বংশগত চর্মরোগ, যার ফলে ত্বক শুষ্ক হয়, চুলকায়, আঁশটে এবং লালচে হয়। খোঁচানোর ফলে ত্বক পুরু হয় ও কখনো কখনো উঠে যায়। এর ফলে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত ত্বক থেকে চুয়ে চুয়ে পানি পড়ে এবং দেখতে ব্রণ আক্রান্ত বলে মনে হয়। এটি সচরাচর বাচ্চাদের মুখে ও ঘাড়ে এবং হাত-পায়ে বেশি দেখা যায়।

অ্যালার্জিক কনজাংটাইভাইটিস

চোখে চুলকানো ও চোখ লাল হয়ে যায়।

খাওয়ার অ্যালার্জি

উপসর্গ : পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া এবং ডায়রিয়া।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত অ্যালার্জি

এটা খুবই মারাত্মক। অ্যালার্জেন শরীরের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে এটা শুরু হয়ে যেতে পারে। নিচে উল্লিখিত উপসর্গগুলো হতে পারে।

* চামড়া লাল হয়ে ফুলে উঠে ও চুলকায়

* শ্বাসকষ্ট, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাঁশির মতো আওয়াজ হয়

* মূর্ছা যেতে পারে

* রক্তচাপ কমে গিয়ে রোগী শকে চলে যেতে পারে

সাধারণ অ্যালার্জি উৎপাদকগুলো

* মাইট * মোল্ড * ফুলের রেণু বা পরাগ * ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক আবহাওয়া * খাদ্যদ্রব্য * ঘরের ধুলা ময়লা * প্রাণীর পশম ও চুল * পোকামাকড়ের কামড় * ওষুধসহ কিছু রাসায়নিক দ্রব্যাদি * প্রসাধনসামগ্রী * উগ্র সুগন্ধী বা তীব্র দুর্গন্ধ।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা

* রক্ত পরীক্ষা: বিশেষত রক্তে ইয়োসিনোফিলের মাত্রা বেশি আছে কিনা তা দেখা।

* সিরাম আইজিইর মাত্রা: সাধারণত অ্যালার্জি রোগীদের ক্ষেত্রে আইজিইর মাত্রা বেশি থাকে।

* স্কিন প্রিক টেস্ট: এ পরীক্ষায় রোগীর চামড়ার ওপর বিভিন্ন অ্যালার্জেন দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং এই পরীক্ষাতে কোন কোন জিনিসে রোগীর অ্যালার্জি আছে তা ধরা পড়ে।

* স্পেসিফিক আইজিই টেস্ট : এই পরীক্ষা স্কিন পিক টেস্টেরই অংশ। এ পরীক্ষাটি ডিজিটাল পদ্ধতির, রক্ত নিয়ে করা হয়।

* বুকের এক্স-রে: হাঁপানি রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরু করার আগে অবশ্যই বুকের এক্স-রে করে নেওয়া দরকার যে, অন্য কোনো কারণে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা।

* স্পাইরোমেট্রি বা ফুসফুসের ক্ষমতা দেখা: এই পরীক্ষা করে রোগীর ফুসফুসের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যায়।

চিকিৎসা

* অ্যালার্জেন পরিহার: যখন অ্যালার্জির সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তা পরিহার করে চললেই সহজ উপায়ে অ্যালার্জি

নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

* ওষুধ প্রয়োগ : অ্যালার্জি ভেদে ওষুধ প্রয়োগ করে অ্যালার্জির উপশম অনেকটা পাওয়া যায়।

অ্যালার্জি ভ্যাকসিন বা ইমুনোথেরাপি: অ্যালার্জি দ্রব্যাদি এড়িয়ে চলা ও ওষুধের পাশাপাশি ভ্যাকসিনও অ্যালার্জিজনিত রোগীদের সুস্থ থাকার অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি।

এ পদ্ধতি ব্যবহারে কর্টিকোস্টেরয়েডের ব্যবহার অনেক কমে যায়। ফলে কর্টিকোস্টেরয়েডের বহুল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এই ভ্যাকসিন পদ্ধতির চিকিৎসাকে অ্যালার্জিজনিত রোগের অন্যতম চিকিৎসা বলে অভিহিত করেন। এটিই অ্যালার্জি রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি সুস্থ থাকার একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি।

আগে ধারণা ছিল, অ্যালার্জি একবার হলে আর সারে না। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসাব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। প্রথম দিকে ধরা পড়লে অ্যালার্জিজনিত রোগ একেবারে সারিয়ে তোলা সম্ভব। অবহেলা করলে এবং রোগ অনেক দিন ধরে চলতে থাকলে নিরাময় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বর্তমানে অ্যালার্জিজনিত রোগের ভ্যাকসিনসহ উন্নত চিকিৎসা আমাদের দেশেই হচ্ছে।

রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে কী খাবেন

রক্তস্বল্পতা একটি জটিল সমস্যা। অনেকেই এই সমস্যায় ভুগে থাকেন। যাপিত জীবনে শৃংখলার অভাব, খাবারে অরুচি, নিয়মমাফিক খাবার গ্রহণ না করাসহ নানা কারণে শরীরে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে আয়রন একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান হিসেবে কাজ করে। যা শরীরে অক্সিজেন পরিবহণে সাহায্য করে। খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়রন

থাকলে তা শরীরে আয়রনের (লৌহ) অভাবজনিত এনিমিয়া (রক্তস্বল্পতা) প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন শমরিতা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের পুষ্টিবিদ খানম উম্মে নাহার।

শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য আয়রনের প্রয়োজন। যেমন- শক্তি উৎপাদন, বৃদ্ধি এবং হরমোন তৈরি। আয়রন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

লোহিত রক্ত কনিকায় হিমোগ্লোবিন থাকে, যা কোষে অক্সিজেন পরিবহণে কাজ করে। শরীরের ৬৫ ভাগ আয়রন হিমোগ্লোবিনে থাকে। সামান্য পরিমাণ আয়রন মায়োগ্লোবিনে পেশি কলায় থাকে। মায়োগ্লোবিন মাংসপেশিতে অক্সিজেন সরবরাহ ও শরীরের স্বাভাবিক কাজের জন্য প্রয়োজন।

খাবারে আয়রনের প্রকারভেদ

আমরা খাবার থেকে দু’ধরনের আয়রন পেয়ে থাকি, যেমন- হিম-আয়রন এবং নন-হিম আয়রন। শরীরে এ দু’ধরনের আয়রন শোষণেও পার্থক্য রয়েছে।

প্রাণিজ খাবার যেমন- গরুর মাংস, মুরগির মাংস এবং মাছে হিম-আয়রন রয়েছে। সাধারণত হিম আয়রন নন-হিম আয়রন অপেক্ষা কম গ্রহণ করা হয়। কিন্তু হিম-আয়রন আমাদের শরীর খুব সহজে শোষণ করতে পারে।

উদ্ভিজ্জ উৎস থেকেই কেবল নন-হিম আয়রন পাওয়া যায়। খাবারে নন-হিম আয়রনের পরিমাণ হিম-আয়রণ অপেক্ষা বেশি থাকে। শরীর নন-হিম আয়রন ভালোভাবে শোষণ করতে পারে না।

ভেজিটেরিয়ানদের (নিরামিষভোজী) মাঝে নন ভেজিটেরিয়ান অপেক্ষা অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

আয়রন সমৃদ্ধ খাবার

হিম ও নন-হিম উভয় ধরনের আয়রন সমৃদ্ধ খাবারের তালিকা নিচে দেয়া হল-

* যকৃত * মাংস (চর্বি ও চামড়া ছাড়া) * সামুদ্রিক খাবার * মসুর ডাল ও মটরশুটি * শুকনা ফল যেমন- আলু-বোখারা, ডুমুর ও কিশমিশ * বাদাম

* শিমের বিচি * ডিম * সয়াবিন * গুড়।

এছাড়া গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি আয়রনের খুব ভালো উৎস।

* পালং শাক * ব্রোকলি * কচু শাক * লাল শাক।

কীভাবে আয়রনের শোষণ বৃদ্ধি করা যায়

ভিটামিন-সি বা অ্যাসকরবিক এসিড আয়রন শোষণে সাহায্য করে।

সকালের নাস্তায় আয়রন সমৃদ্ধ শস্য জাতীয় খাবার খাওয়ার পর কমলার রস বা লেবু পানি গ্রহণে আয়রনের শোষণ বৃদ্ধি পায়। কিছু খাবার ও পানীয় আয়রন শোষণে বাধা সৃষ্টি করে।

টেনিন : চায়ে টেনিন নামক এক ধরনের যৌগ থাকে। টেনিন আমাদের শরীরে আয়রন শোষণের হার হ্রাস করে। তাই খাবার গ্রহণের পর চা পান না করলে ভালো।

ফাইটেট : খাদ্য শস্য, শিম এবং বাদামে ফাইটেট নামক এক ধরনের যৌগ থাকে। এই ফাইটেট সমৃদ্ধ খাবার অতিরিক্ত খাওয়া হলে তা লৌহ শোষণে বাধার সৃষ্টি করে।

চাহিদা: প্রতিদিনের আয়রনের চাহিদা বয়স, লিঙ্গ এবং শারীরিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।

* মহিলাদের ক্ষেত্রে- (১৯-৫০ বছর) পরিমাণ-১৮ সম/ফধু

* পুরুষদের ক্ষেত্রে- (১৯-৫০ বছর) পরিমাণ-৮ সম/ফধু

* গর্ভবতী মহিলাদের ২৭ সম/ফধু যা চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি পায়।

* যেসব মায়েরা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে ৯ সম/ফধু.

সাধারণত খাবারে পর্যাপ্ত আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য থাকলে আয়রনের দৈহিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

* শরীরে আয়রনের অভাব দেখা দিলে তখন যকৃতে সঞ্চিত লৌহ সেই অভাব পূরণে সাহায্য করে। যদি লৌহের সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যায় তখন হিমোগ্লোবিন তৈরি হতে পারে না। একে আয়রনের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা বলে।

সাধারণত রক্তের সিরাম ফেরিটিন (serum ferritin) এবং হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তস্বল্পতা নিশ্চিত করা যায়।

লৌহের অভাবজনিত এনিমিয়ায় যে সমস্যাগুলো দেখা দেয়

* ক্লান্তি * মাথা ঘোরা * ত্বকের রং ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া * চুল পড়ে যাওয়া * খিটখিটেভাব * দুর্বলতা * অস্থির লাগা * নখ স্ফীত ও ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া।

কাদের ক্ষেত্রে এনিমিয়ার ঝুঁকি বেশি

* সন্তান ধারণে সক্ষম মহিলাদের * গর্ভাবস্থায় * খাদ্য তালিকায় আয়রন সমৃদ্ধ খাবারের অভাব হলে * ঘন ঘন রক্ত দান করা * শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষত যারা অপরিণত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে * পরিপাকতন্ত্রের রোগ

* বৃদ্ধ বয়সে * নিরামিষভোজীদের ক্ষেত্রে।

টানা বসে থাকায় কোমর ব্যথা থেকে উপশমের উপায়

অনেকেই আছেন যারা দিনের ১২-১৪ ঘণ্টা কাটিয়ে দেন অফিসঘরে। বাংলাদেশের ব্যাংকারদের উপর পরিচালিত একটি গবেষণা জানাচ্ছে যে, যারা বেশি সময় অফিসে বসে কাজ করেন তাদের ঘাড়, কোমর, হাটু বা কাঁধ ব্যথা হবার প্রবণতা যারা কম সময় বসে থাকেন তাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এক কথায় যাকে বলা যায় অফিস সিনড্রোম।

অফিসে টানা বসে থেকে কোমর ব্যথা থেকে উপশমের উপায় নিয়ে লিখেছেন উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফিজিওথেরাপি বিভাগীয় প্রধান ডা. মোহাম্মদ আলী।

মানুষ জন্মগত ভাবেই নড়াচড়া প্রবণ জীব। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই আহার সংগ্রহে মানুষ শারীরিক শ্রম দিত। একটি শিকার করতে আমাদের পূর্ব পুরুষরা বিপুল শারীরিক শক্তি ব্যয় করত। কিন্তু আমাদের

আধুনিক জীবন অনেকটাই মেধা নির্ভর। চেয়ার- টেবিল বা কম্পিউটার-মোবাইলের সামনে বসেই বেশিরভাগ সময় কাটে আমাদের। ফলশ্রুতিতে হাড়-মাংসপেশিতে আসে জড়তা। বাইরে সূর্যের আলোতে কম আসাতে আমাদের শরীরে দেখা দেয় ভিটামিন-ডি’র ঘাটতি। সব মিলিয়ে স্থবির থাকতে থাকতে আমাদের শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাংসপেশি ও হাড়ের জড়তা প্রকাশ পায় ব্যথার মাধ্যমে। হাড়ের ক্ষয়, মাংসপেশির দূর্বলতাজনিত ব্যথা জেকে বসে আমাদের শরীরে।

একসময় ভাবা হত যারা ভারি কাজ করেন, অস্বস্থিকর ভঙ্গিমায় বসে বা দাঁড়িয়ে থাকেন কেবল তাদেরই ঘাড়-কোমর ব্যথা বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক কালের গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা; প্রকৃতপক্ষে যারা দীর্ঘ সময় একই ভংগিমায় কাজ করেন তাদেরই ব্যথাজনিত শারীরিক সমস্যা বেশি হয়। অনেকেই ভাবেন, খুব আধুনিক চেয়ারে বসে ১২-১৪ ঘণ্টা টানা কাজ করলেও ঘাড় বা কোমর ব্যথায় আক্রান্ত হবার সম্ভবনা নেই। বিষয়টি কিন্তু তেমন নয়; আসলে আপনি একই ভংগিমায় কতক্ষণ কাজ করলেন সেটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ভংগিমা যে কোন রকম হতে পারে, ব্যথামুক্ত থাকার শর্ত হলো সেই ভংগিমায় বেশিক্ষন থাকা যাবে না।

পরিত্রাণের উপায় কী

প্রথম শর্ত হলো, একভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা যাবে না। প্রতি একঘন্টায় এক মিনিটের জন্য হলেও পজিশন পরিবর্তন করতে হবে। সুযোগ থাকলে হালকা স্ট্রেচিং করা যেতে পারে। কিছু খুব সাধারণ অথচ বিশেষ ব্যায়াম আছে যা অফিসের চেয়ারে বসেই করা যায়, সেগুলো জানতে হবে। যারা ইতোমধ্যেই ব্যথায় আক্রান্ত তারা বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।

দ্বিতীয়ত, আপনার মোবিলিটি বা নাড়াচাড়া বাড়াতে হবে। একটি শ্লোগান মনে রাখা দরকার, ‘সুস্থ থাকতে হাটতে হবে’। অনেকেই অজুহাত দেন যে তাদের হাটার সময় নেই। কিন্তু আপনি চাইলেই হাটতে পারেন। যেমন ধরুন অফিস থেকে বাসায় ফিরতে যেটুকু রাস্তা রিক্সায় আসেন সেটুকু আজ থেকে হেটে আসুন অথবা সাধের প্রাইভেট কারটা গ্যারেজে রেখে হেটে অফিস করুন, দেখবেন অর্থও সাশ্রয় হচ্ছে সাথে ভালো থাকছে শরীর ও মন।

পরিশেষে, প্রায়ই বেরিয়ে পড়ুন এডভেঞ্চারে। হাতে সময় কম থাকলে আশেপাশের টুরিস্ট স্পট ভিজিট করুন। সাঁতার কাটুন, দৌড়ান বা হিল

ট্রাকিং করুন। শারীরিকশ্রমের সাথে সাথে পাবেন সূর্যের ভিটামিন ডি। মনে রাখুন, আমাদের পূর্বপূরুষদের সবকিছুই ছিলো শারীরিক শ্রম নির্ভর। আপনিও এই জেনেটিক্সের বাইরের কেউ নন!

হাঁটতে হাঁটতে সুস্থ থাকুন

প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটলে শরীরে রোগবালাই সহজে বাসা বাঁধতে পারে না। যেকোনো বয়সীদের জন্যই ওয়াকিং এক্সারসাইজ শারীরিক সুস্থতা এনে দেবে। ঠিক কতটা সময় হাঁটলে উপকার পাওয়া যাবে, এমন প্রশ্নের উত্তর হলো ৩০ থেকে ৪০ মিনিট। ধীরে ধীরে সেটা ১ ঘণ্টা হলে ভালো।

অতিরিক্ত ওজন নিয়ে যারা চিন্তিত তাদের জন্য হাঁটা খুব ভালো এক্সারসাইজ। পাশাপাশি হাঁটা হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতে এবং ক্যানসারসহ অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, আর্থ্রাটিস, অস্টিওপোরোসিসের মতো অসুখের সঙ্গে লড়তেও সাহায্য করে।
এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ মিনিট হাঁটলে অসময়ে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৪ শতাংশ কমে যায় এবং ৬১-৮১ বছরের মহিলা এবং পুরুষরা যদি প্রতিদিন দুই মাইল হাঁটতে পারেন তাহলে যেকোনো ধরনের অসুখের থেকে মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পায়।

হাঁটার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো একে নিজের প্রয়োজনে কমানো কিংবা বাড়ানোর সম্ভব। যারা কখনো ব্যায়াম করনে না বা কোনো বড় আঘাত থেকে সেরে ওঠছেন অথবা সদ্য মা হয়েছেন তারা প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ দিন ২০ মিনিট করে হাঁটা শুরু করতে পারেন। ধীরে ধীরে ফিটনেস লেভেল বাড়লে সময়টা ৫০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা করতে পারেন। সপ্তাহে ৫ থেকে ৬ দিন হাঁটতে পারেন। সময়ের পাশাপাশি ওয়াকিং স্পিডও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে কেউ যদি হাঁটতে পারে তাহলে খুব ভালো ফল পাবেন।

প্রথমদিকে ৭ থেকে ১০ মিনিট রিল্যাক্স করে হাঁটুন। এরপর কিছু হালকা স্ট্রেচ প্র্যাকটিস করুন। পায়ের সমস্ত পেশিকে ভালোভাবে প্রসারিত করতে হবে। একই ভাবে পিঠের মাসলগুলোও প্রসারিত করুন।

প্রয়োজনে একজন ফিটনেস এক্সপার্টের কাছ থেকে পরামর্শ করে জেনে

নিন কোন ধরনের স্ট্রেচিং আপনার জন্য উপযুক্ত। তবে অন্যান্য ওয়র্কআউটের মতো হাঁটার আগেও শরীরকে ‘ওয়ার্ম আপ’ এবং ‘কুলিং ডাউন’ করাটা ভালো।

মাছের উপকারী উপাদান শরীরে যেভাবে কাজ করে

মাছ খাওয়ার উপকার বলে শেষ করা যাবে না। মাছ এমন পুষ্টিকর খাবার যা বেশি পরিমাণে খাওয়া যায়। এতে শরীর ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ঘটে।

আমাদের খাবারের মধ্যে দুই ধরনের চর্বি আছে। একটি সম্পৃক্ত চর্বি, অন্যটি অসম্পৃক্ত চর্বি। মাছ অসম্পৃক্ত চর্বি ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস। ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো Docosahxaenoic acid বা DHA। DHA এমন একটি উপাদান যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে সচল ও স্বাভাবিক রাখে।

মাছের পুষ্টিগুণ ও উপকারী উপাদান নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন বারডেমের চিফ নিউট্রিশন অফিসার আখতারুন নাহার আলো।

শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ও স্মৃতিশক্তি ইত্যাদির সঙ্গে ডিএইএ-র নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া এটি চোখের দৃষ্টিশক্তির জন্যও প্রয়োজন। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, সব মায়েরা গর্ভাবস্থায় অথবা এর আগে নিয়মিতভাবে মাছ খেয়েছেন, তাদের দুধে DHA-এর মাত্রা বেশি থাকে। আবার যে মায়েরা একেবারেই মাছ খাননি, তাদের দুধে DHA-এর মাত্রা কম থাকে।

জন্মের পর শিশু মায়ের দুধ থেকে DHA প্রাপ্ত হয়। মাছের তেলে যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে সেটা রক্তের কলস্টেরলকে রক্তনালিতে জমাট বাঁধতে দেয় না। দেখা গেছে মাছের তেল হৃদরোগীদের জন্য খুবই ভালো। এছাড়া প্রদাহজনিত সমস্যা যেমন-চর্মরোগ, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, রিউম্যাটিক আর্থ্রাইটিস এ এর ফল চমৎকার। ড্যানিশ বিজ্ঞানীদের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসী যারা নিয়মিত মাছের তেল খায়; তাদের হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কম

হয়। ডাচ বৈজ্ঞানিকেরা দেখান যে, যারা প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ২৫ গ্রাম করেও মাছ খান, তাদের তুলনায় যারা একবারেই মাছ খাননা, তারা হৃদরোগে বেশি আক্রান্ত হয়। মাছের তেল ধমনির মধ্যে চর্বির স্তর গঠন রোধ করে।

হাভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষকরা দেখলেন যে, মাছের তেলে প্রোস্টাগ্লাডিন নামক যে রাসায়নিক পদার্থ আছে, তা ক্যানসার বিস্তার রোধ করে। পাশ্চাত্যের খাবারগুলোতে খুব কম পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।

এদিকে পাশ্চাত্যের প্রভাবে আমাদের দেশেও মাছ খাওয়ার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। আজ যে কিশোরী, পরবর্তী সময়ে সে সন্তানের মা হবে। অথচ তারাই মাছের পরিবর্তে ব্রয়লার মুরগির প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। ভবিষ্যতে যেসব শিশু জন্মাবে তাদের দেহে DHA-এর ঘটতি দেখা দেবে। ফলে পড়াশোনা ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তারা পিছিয়ে পড়বে।

যেহেতু DHA ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড দৃষ্টিশক্তির উন্নতি, ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধি, পড়াশোনার ক্ষমতা বাড়া, বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি এবং স্নায়ুতন্ত্র ঠিক রাখাসহ হৃদরোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সেহেতু প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় মাছ অবশ্যই রাখা উচিত।

বর্ষায় শুষ্ক ত্বকের যত্ন

বর্ষাকাল মানেই ভ্যাপসা গরম, যখন তখন বৃষ্টি আর কাঠফাটা রোদ। এ সময়ে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও যথেষ্ট বেশি। ঠিকঠাক যত্ন না নিলে ত্বক রুক্ষ, প্রাণহীন হয়ে পড়ে। ত্বকে ব্রণ ও অ্যালার্জির সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

যাদের তৈলাক্ত ত্বক, তাদের সমস্যা আরও বেশি। ত্বক বিশেষজ্ঞরা বলেন, শুধু বর্ষায় নয়, সারা বছরই ত্বক যত্নে রাখা প্রয়োজন। বর্ষায় ত্বক আর্দ্র রাখার জন্য চাই আলাদা সতর্কতা। যেকোনো ঋতুতেই সানস্ক্রিন লোশন ব্যবহার করা জরুরি। এর পাশাপাশি, ভালো ভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে নিজের ত্বক। তার জন্য রাতে ত্বকের যত্নে বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে। জেনে নিন বর্ষার রাতে ত্বকের যত্ন

কীভাবে নেবেন।

দুধ দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করতে পারেন। ত্বকের যত্নে দুধের মতো উপকরণ খুব কম আছে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে কাঁচা দুধ দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে নিন। ত্বক নরম হবে এবং ত্বকের সব ময়লাও এতে ওঠে যাবে।

যদিও বাতাসে বেশি আদ্রতা তারপরেও বর্ষাতে মাঝেমাঝে ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মৃত কোষ তুলে ফেলা প্রয়োজন। তাই মাঝেমধ্যেই নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল দিয়ে ত্বকে মালিশ করতে পারেন। তারপর হালকা গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত দুদিন এই অভ্যাস করলে উপকার পাবেন।
প্রতি রাতে বেশ ঘন কোনো ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন। ক্রিম দিয়ে ত্বক মালিশও করতে পারেন। এতে ত্বক শুধু নরমই হবে না, আর্দ্রও থাকবে।

সপ্তাহে একবার বাড়িতে কোনো ফেস মাস্ক বানিয়ে নিতে পারেন। কলা চটকে তাতে মধু আর দই মিশিয়ে মাস্ক বানিয়ে ফেলতে পারেন। রাতে শোয়ার আগে সেই মাস্ক মুখে মেখে মিনিট দশেক রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বক নরম ও মসৃণ লাগছে।

বর্ষাকালে কী কী চর্মরোগ হয়, চিকিৎসা

তীব্র তাপদাহের পর শুরু হয়েছে বৃষ্টি। তারপরও মাঝে মধ্যেই গরমে নাজেহাল হতে হয়। ঘেমে অস্থির অবস্থা।

এ সময় চুলকানিসহ নানা চর্মরোগ দেখা দিয়ে থাকে। অত্যধিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টির দাপটে বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে শরীরে প্রচুর ঘাম হয়। এ কারণে এসব রোগব্যাধি দেখা দেয়।

বর্ষাকালীন চর্মরোগ ও এর চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ত্বক ও যৌনব্যাধি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. রাশেদ মোহাম্মদ খান।

কী কী রোগ হতে পারে

বর্ষায় ত্বকে মূলত যে ধরনের ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ হয় সেসব রোগ ছাড়াও আরও কয়েকটি ত্বকের রোগ নিয়ে নিচে জানানো হল।

টিনিয়া করপোরিস

ত্বকে সাধারণত গোল গোল লিসিয়ন হয়। অনেক সময় শরীরের বিভিন্ন অংশে এরা চাক বেঁধেও হতে পারে।

উপসর্গ: গোল গোল লিসিয়নে আক্রান্ত জায়গাগুলো ভীষণ চুলকায় ও জ্বালা করে। আক্রান্ত মানুষটি রোদে বেরোলে সমস্যা বাড়ে।

চিকিৎসা: ফাঙ্গাসনাশক অ্যান্টি হিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খেলে এবং আক্রান্ত স্থানে মলম লাগালে এই রোগ সেরে যায়।

টিনিয়া পেডিস

সাধারণত পায়ের পাতায় বা আঙুলের ভাঁজে ছত্রাক জমার কারণে টিনিয়া পেডিস রোগটি হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা বেশি দেখা যায়।

উপসর্গ : আক্রান্ত অংশ খুব চুলকায় ও জ্বালা করে। রোগের প্রকোপ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় অবহেলা করলে পরে সংক্রমণ হয়ে গিয়ে সমস্যা জটিলতর হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা : কিটোকোনাজোল জাতীয় ওষুধ লাগালে উপকার হয়।

পিটিরিয়াসিস ভারসিকালার

চলতি কথায় ‘ছুলি’ নামে পরিচিত। এটি একটি ছত্রাক ঘটিত সংক্রমণ। ছুলি অনেক রঙের হতে পারে। যেমন, হালকা সাদা, আবছা সাদা, হালকা বা গাঢ় বাদামি ইত্যাদি। বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান বেড়ে গেলে ছুলির জন্য দায়ী ছত্রাকের বংশবিস্তারে সুবিধে হয়।

উপসর্গ: গোল সাদা বা বিভিন্ন রঙের ছুলি হতে পারে। এরা ত্বকের ওপরে প্রকাশ পায়। শরীরের উপরিভাগে, বিশেষত মুখে ছুলি বেশি হয়। যে সব শিশু অপুষ্টিতে ভোগে বা যাদের বংশগত প্রবণতা রয়েছে, তাদের ছুলি হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

প্রতিকার : নিয়মিত চিকিৎসায় ছুলি সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায়। ছুলি রোধ করতে শরীর শুকনো রাখা প্রয়োজন। যেমন-বৃষ্টিতে ভিজে গেলে ভাল করে গা মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সুতির পোশাক পরে নেওয়া উচিত।

চিকিৎসা: খাওয়ার ওষুধ হিসেবে ফ্লুকোনাজোল ট্যাবলেট অথবা কিটোকোনাজোল জাতীয় ট্যাবলেট পানিতে গুলে নির্দিষ্ট মাত্রায় খাওয়ানো দরকার। লাগাবার ওষুধ হিসেবে ক্লোটাইমাজোল, কিটোকোনাজোল অথবা জিঙ্ক পারক্সাইড জাতীয় ক্রিম লাগানো যায়। অনেক সময় মাথায় ছুলির ছত্রাক বাসা বাঁধে, তখন কিটোকোনাজোল শ্যাম্পু ব্যবহার করা যায়। মাথায় ছত্রাক সংক্রমণ হলে গ্রিসিওফালভিন সিরাপ খেলে সুফল পাওয়া যায়।

ইমপেটাইগো

ইমপেটাইগো দু’ধরনের হয়-একটি ফোঁড়া ধরনের, অন্যটি সাধারণ ইমপেটাইগো। সাধারণ ইমপেটাইগো-তে শরীরে পাতলা ফোস্কার সৃষ্টি হয়। এই ফোস্কা একসঙ্গে অনেকগুলি হয় এবং ধীরে ধীরে ফেটে গিয়ে হলদেটে রঙের হয়ে যায়।

ফোঁড়া ধরনের ইমপেটাইগোগুলি অবশ্য ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। এদের ভেতরের পুঁজ জমে ফেটে যায় এবং বাদামি আকার ধারণ করে। মুখে, ঘাড়ে এবং হাতে বা পায়ে ইমপেটাইগো বেশি হয়।

ইন্টারট্রাইগো বা ক্যানডিডাল ইনফেকশন

ছোট শিশুদের প্রায়ই এ রোগ হয়। রোগটির অন্য নাম ক্যানডিডাল ইনফেকশন। বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াই এ রোগের জন্য দায়ী। শিশুকে ঠিকমতো পরিষ্কার না রাখলেও এ রোগ হতে পারে। শরীরের বিভিন্ন ভাঁজে যেমন ঘাড় ও বিশেষ করে কুঁচকিতে ইন্টারট্রাইগো বেশি হয়। আক্রান্ত স্থান লাল আকার ধারণ করে।

ন্যাপি র্যাশ

ন্যাপি র্যাশ বা ন্যাপকিন ডার্মাটাইটিসের মূল কারণ ভিজে ন্যাপকিনের সংস্পর্শ এবং বর্ষার আদ্র আবহাওয়া। ডায়াপারের ঘষা লেগে শিশুর কচি ত্বক ছড়ে গেলে মূত্রে থাকা জীবানুরা ভিজে ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে ছড়িয়ে পড়ে।

উপসর্গ: তলপেট, কুঁচকি, থাইয়ের ওপরের অংশে এ সমস্যা বেশি হয়।

তাই এ-সব জায়গা সবসময় শুকনো রাখার চেষ্টা করা উচিত। অপ্রয়োজনে ডায়াপার লাগানো উচিত নয়।

প্রতিকার : খোলামেলা ও শুকনো থাকলে ন্যাপি র্যাশ হয় না। থাই ও কুঁচকি সবসময় যথাসম্ভব শুকনো রাখা উচিত। শিশুরা যাতে প্রস্রাব-পায়খানার মধ্যে শুয়ে না থাকে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। বাচ্চাদের সফট্ বেবি সোপ দিয়ে গোসল করানো ভাল।

চিকিৎসা: ন্যাপি র্যাশ উপশমে প্রয়োজনে জিঙ্ক অক্সাইড, টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড ইত্যাদি লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্কেবিস

বর্ষাকালে এই সমস্যা খুব স্বাভাবিক। এ সমস্যায় আক্রান্ত অংশ খুব চুলকায়। দিন থেকে রাতের দিকে চুলকানি বাড়ে। হাতের কবজি, আঙুলের ফাঁক, আঙুলের চারধার, মাথা ও দেহের খাঁজে এ সমস্যা হতে দেখা যায়। আক্রান্তস্থলে লাল দানা আকারের ক্ষত হয়।

সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করানো হলে মাসের পর মাস রোগী এ সমস্যায় ভুগতে পারেন। পার্মাইট ক্রিম ব্যবহারে সুফল মেলে।

ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের কি স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি

ডায়াবেটিস রোগীর উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার হার রোগীর কত দিনের ডায়াবেটিস, তার বয়স, লিঙ্গ, দৈহিক স্থূলতা, রোগের পারিবারিক ইতিহাস, শারীরিক শ্রম, খাদ্যাভ্যাস (বিশেষত লবণ খাওয়া) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রোগের উপস্থিতি, বর্ণ, ওষুধ সেবন ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

বস্তুত যারা ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ দুটিতেই আক্রান্ত তাদের হৃদরোগ, স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে; কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত

হওয়া, চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া এবং সর্বোপরি মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। বিপুলসংখ্যক ডায়াবেটিস রোগী এ দলভুক্ত। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য উচ্চ রক্তচাপ বলতে ১৪০/৯০ মি.মি পারদ।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হরমোন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডা. শাহজাদা সেলিম।

ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ পরস্পর সম্পর্কিত কোনো সমস্যা নাকি স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগীর উচ্চ রক্তচাপ একটি আলাদা শারীরিক সমস্যা। বিশেষত যারা উচ্চ রক্তচাপ থাকা অবস্থাতেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন। ২০০৮ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রর ২০ বছরের বেশি বয়সী ডায়াবেটিস রোগীর ৭৩ শতাংশই উচ্চ রক্তচাপেও ভুগছিল। বাংলাদেশি ডায়াবেটিস রোগীদের মাঝে উচ্চ রক্তচাপে ভোগার হার সুনিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও এটি যে অনেক বেশি হবে তা অনুমান করা যায়।

ডায়াবেটিস শরীরের সব অংশেই হানা দেয়। এতে স্বল্পস্থায়ী এবং দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন রকম ক্ষতি সাধিত হতে থাকে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হৃদপিণ্ড ও রক্তনালিসহ রক্ত সংবহনতন্ত্রের সব অংশ। রক্ত নালির দেয়ালের ইলাস্টিসিটি হ্রাস পেতে থাকে। এতে হৃদরোগের ঝুঁকি যেমন বাড়ে তেমনি উচ্চ রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ডায়াবেটিস না থাকলে এ ঝুঁকি অনেক কম থাকতে পারত।

ডায়াবেটিস রোগীর মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, রেটিনা, প্রজনন তন্ত্র, ত্বক অতি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। যেসব মহিলা ডায়াবেটিস নিয়েই গর্ভধারণ করেন অথবা গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞও প্রসূতিবিদ যেমন খুবই সতর্কতার সঙ্গে এগোতে চান তেমনি গর্ভবতী ও তার পরিবারকেও গভীরভাবে অনুধাবন করে চিকিৎসায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কেননা, এসব গর্ভবতী নারীর প্রি-একলামশিয়া ও একলামশিয়া নামক মারাত্মক গর্ভকালীন জটিলতায় ভোগার ঝুঁকি অনেক বেশি।

উচ্চ রক্তচাপ প্রধানত একটি লক্ষণ বিহীন স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই অন্য মানুষদের মতই ডায়াবেটিসেও রক্ত চাপ মেপে তা শনাক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। যাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকছে তাদেরও বছরে কমপক্ষে চারবার আদর্শ পদ্ধতিতে রক্তচাপ মেপে তিনি উচ্চ রক্তচাপে

ভোগছেন কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি সিদ্ধান্ত না নেয়া যায় পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতি দিনের বিভিন্ন সময়ের রক্তচাপের গড় হিসেব করে সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। আর ডায়াবেটিসের রোগীরা যখন নিয়মিত ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের কাছে যান তখন তিনি সব ডায়াবেটিসের রোগীকেই রক্তচাপ মেপে রোগ শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ডায়াবেটিস এখন মহামারী আকারে বিরাজ করছে। উচ্চ রক্তচাপ পৃথিবী ব্যাপী একটি নীরব ঘাতক এবং দুটোই বর্তমানের চেয়ে রোগীর জন্য ভবিষ্যতে বেশি ঝুঁকি তৈরি করে। অতএব, রোগীর চিকিৎসা তো করতে হবেই বরং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যতটা বেশি উদ্যোগ নেয়া যায় ততটা লাভজনক হবে। ডায়াবেটিসের সব রোগীর সব অবস্থাতেই প্রথম ও প্রধানতম কাজ হল- কাক্সিক্ষত মাত্রায় রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ। যদিও এটি রোগীভেদে বিভিন্ন রকম হবে। আর উচ্চ রক্তচাপকে বিবেচনায় নিয়ে নিন্মোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

- নিয়মিত রক্তচাপের রের্কড সংগ্রহ করুন

- উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করা

- যাদের এখনও রক্তচাপ স্বাভাবিক আছে সেসব ডায়াবেটিসের রোগীর জন্য
আনন্দের বার্তা হল- সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আপনি দীর্ঘদিন রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সমর্থ হবেন।

প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ

- লবণ খাওয়া কমাতে হবে [আলগা লবণ বর্জন করুন, তরকারি-ভাজি-ভর্তাতে
লবণ সীমিত করুন, অতিরিক্ত লবণ দেয়া খাদ্য বর্জন করুন (সল্টেট বিস্কুট, ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবার ইত্যাদি)]

- দৈহিক উচ্চতা অনুসারে কাক্সিক্ষত দৈহিক ওজন অর্জন করুন ও বজায়
রাখুন

- শারীরিক শ্রমময় জীবনযাপন করুন। যাদের জীবনযাপন প্রধানত শারীরিক
শ্রমহীন, তাদের শারীরিক শ্রম বৃদ্ধির প্রয়াশ নিতে হবে

- সপ্তাহের অধিকাংশ দিন (পারলে প্রতিদিন) ৩০ মিনিট করে হাঁটুন।
যাদের পক্ষে তা সম্ভব নয় তারা সপ্তাহে ১ দিন একটানা ১৫০ মিনিট হাঁটতে পারেন।

-[redacted]

-[redacted]

-[redacted]

-[redacted]

-[redacted]

-[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

* [redacted]

* [redacted]

* [redacted]

[redacted]